ভাবনা থিয়েটার

ISSN 2321-5909

VABNA THEATRE ... beyond greenroom

a bilingual international theatre journal

নাট্যচর্চায় দর্শক

SPECTATORS in theatre

বিশেষ বই সংখ্যা ২০২১

Special book issue 2021

ভাবনা থিয়েটার

VABNA THEATRE . . beyond greenroom

দ্বিভাষিক আন্তর্জাতিক নাট্যপত্র
ISSN 2321-5909

বর্ষ ১১। বিশেষ সংখ্যা
ডিসেম্বর ২০২১

Vabna Theatre

A Bilingual International Theatre Journal
(Peer Reviewed & Referred)

Vol. 11 Special issue
December 2021

নাট্যচর্চায় দর্শক

Spectarors in Theatre

BEYOND GREENROOM
publications

ভাবনা থিয়েটার
VABNA THEATRE
বর্ষ ১১। বিশেষ সংখ্যা
Vol. 11 Special issue
ডিসেম্বর ২০২১
December 2021

প্রধান সম্পাদক অভীক ভট্টাচার্য
Editor-in-Chief Avik Bhattacharya

সম্পাদকমণ্ডলী ঋষি ঘোষ ব্রতীন রায় দেবব্রত ব্যানার্জী
সুমনা চক্রবর্তী (ভট্টাচার্য) অজয় বিশ্বাস
Editorial Board Rishi Ghosh Bratin Roy Debobrata Banerjee
Sumana Chakraborty (Bhattacharya) Ajoy Biswas

প্রচ্ছদ অভীক ভট্টাচার্য
Cover Avik Bhattacharya

বিশেষ সহযোগিতা অনীশ সাহা
Special Assitance Anish Saha

বর্ণসংস্থাপন পলি মণ্ডল মিতা সাহা
Letter Setting Poly Mondal Mita Saha

মুদ্রণ এন.আই.সি.জি. বারাসাত কলকাতা - ১২৪ কথা +৯১ ৯৮৩০১৯১২৬৫
Print N.I.C.G. Barasat Kolkata-124 M: 9830191265

সম্পাদকীয় দপ্তর জ্যোৎস্না আবাসন
ব্লক - এ ফ্ল্যাট - এফ ৩ দ্বিতীয় তল হৃদয়পুর কলকাতা - ১২৭
কথা +৯১ ৯৪৩৩১২৫০৫৩/৮৪২০৩৮৯৮৪৮
Editorial desk Jyotsna Abasan Block -A Flat- F3 1st Floor
Hridaypur Kolkata-127 M: +91 9433125053 / 8420389848
e-mail : theatrevabna@gmail.com

ভারতে পরিবেশক পাতিরাম ধ্যানবিন্দু (কলেজ স্ট্রিট) ভাবনা জংশন
Distributor : India Patiram Dhyanbindu (College Street) Vabna Junction

বিনিময় একশো আশি টাকা (ভারত) / দুইশো টাকা (বাংলাদেশ)
Price Rs. 180/- (India) / Taka 200 (Bangladesh)

ভাবনা থিয়েটার

বর্ষ ১১ ॥ বিশেষ সংখ্যা ॥ ডিসেম্বর ২০২১

বিশেষ সংখ্যা

নাট্যচর্চায় দর্শক

Spectators in Theatre

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ৯

প্রবন্ধ

আশিস গোস্বামী ১৩
Anna Maria Schlemmer ১৮
সঞ্জয় গাঙ্গুলী ২৩
অংশুমান ভৌমিক ২৮
গুণাকর দেব গোস্বামী ৩৭
Pravin Shekhar ৪১
জুলফিকার জিন্না ৪৭
শুদ্ধসত্ত্ব ঘোষ ৫৬
পার্থপ্রতিম মিত্র ৬৩
ড. বাবুল বিশ্বাস ৭৫
মোনালিসা চট্টোপাধ্যায় ১০৬
Ranhang Choudhury ১১৩
মলয় ঘোষ ১২০
তুষার ভট্টাচার্য ১২৬
অনিলরঞ্জন ভৌমিক ১৩৪
সুদীপ গুপ্ত ১৪১
আবু সঈদ তুলু ১৪৪
হিমাদ্রি মণ্ডল ১৫১
সায়ন ভট্টাচার্য ১৫৭
বিভাস বিষ্ণু চৌধুরী ১৬২

বসন্ত পাথ্রডকর ১৬৫
তমাল সেন ১৭৪
ব্রতীন রায় ১৮৬

কথপোকথন

কৌশিক চট্টোপাধায় ১৯৫

বিশেষ প্রবন্ধ

ড. শান্তি সরেন ২০৫
অসীম দাশ ২১৩
উৎপল বাগ ২৩১
Bidhan Mondal ২৪০
আশিস রায় ২৫০
সুবীর মহাজন ২৫৮
অনুপম দাশগুপ্ত ২৮৫
মোঃ মাহমুদাল হক জিহাদ ২৯০

নাটক

দেবাশিস ৩০৩
সঞ্জয় আচার্য ৩৩৫
সুমিত দাশগুপ্ত ৩৪৬

নাট্য আলোচনা

ব্রতীন রায় ৩৫৭

রেখাচিত্রে 'দর্শক'

৩৬৩-৩৬৬

দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ ও রবীন্দ্র নাটক

আশিস রায়

বস্তুবিশ্বে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ শোষিত হন মুষ্টিমেয় শোষকের হাতে নিরন্তর। চেতনার ঊর্ধ্বতন যখন শোষিতের প্রাণে বিপ্লবের দীপশিখা জ্বালিয়ে তুলে, তখনই মূর্তি পায় দিন বদলের গান। শোষক আর শোষিতের এই দ্বন্দ্বই দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের আঁতের কথা। মার্কসের কলম থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত এই মতবাদ আজও সমান প্রাসঙ্গিক। বিশ্বকবি যেমন ভাবে বিশ্বের বার্তা প্রাণ ভরে শুনেছিলেন তেমনই শুনেছেন আর্তের কান্না, শোষিতের বিপ্লবী জাগরণ। তাই প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষে সে জাগরী তাঁর সৃষ্টি চৈতন্যে লগ্ন হয়ে গিয়েছিল। তাই রবীন্দ্রনাথ মার্কসবাদী না হয়েও নিজের সৃষ্টির মধ্যে রেখে গেছেন মার্কসীয় চিন্তা-চেতনার ছাপ। সেই চেতনাতেই অনুসন্ধানী দৃষ্টি বোলালে দেখা মেলে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের প্রক্ষেপণ। আলোচনার সুবিধার্থে তিনটি নাটকের প্রাণকেন্দ্রে সেই দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ কতোটা প্রকটতা লাভ করেছে তার অনুসন্ধান করবো।

জানুয়ারি, ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে, প্রথম সপ্তাহে তিনি রচনা শুরু করলেন এবং সপ্তাহ একের মধ্যে সমাপ্ত করেন, গান্ধিজির সম্বন্ধে আলোচনার পর আন্দোলন সম্পর্কে তাঁর মনে যে প্রতিক্রিয়ার জন্ম হয়েছিল 'মুক্তধারা' তারই প্রকাশ। এর বিষয়বস্তু সাম্রাজ্যবাদী দেশের বিরুদ্ধে দুর্বল উপনিবেশের মুক্তি সংগ্রাম।

মুক্তধারার প্রথম নাম দিয়েছিলেন 'পথ', এর কারণ নাটকের সমস্ত ঘটনা রাজপথে অনুষ্ঠিত। এখানে রাজা থেকে সকলেই পথের পথিক। এর কারণ মনে হয়, কবি তাঁর দ্বন্দ্ব নিরসনে একটি পথ অন্বেষণ করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে নাম পরিবর্তন করে এর নাম রাখলেন 'মুক্তধারা' যাতে জীবনের সমস্তধারা মুক্ত হয়েছে।

মুক্তি চাই সাম্রাজ্যবাদ থেকে। এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ সাম্রাজ্যবাদকে বিশাল নৈর্ব্যক্তিক বৈজ্ঞানিক শক্তি সম্পন্ন যন্ত্র হিসাবে দেখেছেন। ড. কালিদাস নাগকে একটি চিঠিতে বলছেন, '... তোমার চিঠিতে তুমি Machine সম্বন্ধে যে আলোচনার কথা লিখেছ সেই Machine এই নাটকের একটি অংশ। এই যন্ত্র প্রাণকে আঘাত করেছে। অতএব প্রাণ দিয়েই সেই যন্ত্রকে অভিজিৎ ভেঙেছে, যন্ত্র দিয়ে নয়। যন্ত্র দিয়ে যারা মানুষকে আঘাত করে তাদের একটা বিষম শোচনীয়তা আছে,— কেননা যে মানুষকে তারা মারে সেই মনুষ্যত্ব যে তাদের নিজের মধ্যেও আছে, তাদের যন্ত্রই তাদের নিজের ভিতরকার মানুষকে মারছে, আমার নাটকের অভিজিৎ হচ্ছে সেই মার খানেওয়ালার ভিতরকার মানুষ... যাতে আঘাত করা হচ্ছে সে সেই আঘাতের দ্বারাই আঘাতের অতীত হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু যে মানুষ আঘাত করছে আত্মার ট্র্যাজেডি তারই মুক্তির সাধনা তাকেই করতে হবে, যন্ত্রকে প্রাণ দিয়ে ভাঙবার ভার তারই হাতে। পৃথিবীতে যন্ত্রী বলছে, 'মার লাগিয়ে জয়ী হব' পৃথিবীতে মন্ত্রী বলছে, 'হে মন, মারকে ছাড়িয়ে উঠে জয়ী হও।' আর নিজের যন্ত্রে নিজে বন্দি মানুষটি বলছে, 'প্রাণের দ্বারা যন্ত্রের হাত থেকে মুক্তি পেতে হবে মুক্তি দিতে হবে' যন্ত্রী হচ্ছে বিভূতি, মন্ত্রী হচ্ছে ধনঞ্জয়, আর মানুষ হচ্ছে অভিজিৎ।' (র-চ-১৪।। ৫৩২-৫৩৩)

নাটকের পটভূমিকে লক্ষ করলে দেখা যাবে, একটি রাজপথের শেষে দূর আকাশে একটি অভ্রভেদী লৌহযন্ত্রের মাথাটা দেখা যাচ্ছে তার ঠিক অপর দিকে ভৈরব মন্দির চূড়ার ত্রিশূল, নাটকে সর্বক্ষণ দর্শকের সামনে পটভূমিকায় এই প্রতীক অবস্থিত। ত্রিশূলকে যেন মনে হচ্ছে দেবতার সতর্কীকরণ নির্দেশ এবং তার বিরুদ্ধে যন্ত্রদানবের প্রতিরোধ হুমকি। এই সময়ে দাঁড়িয়েও রবীন্দ্রনাথের মন এখনো আদিকাল থেকে দেব-দৈত্য, ঈশ্বর-শয়তানের চিরন্তন বিরোধের দ্বারা অধিকৃত। সমগ্র বিশ্ব জগতটাই শুভ-অশুভ শক্তির মধ্যে সংগ্রামের রণভূমি। তিনি বারেবারে উপলব্ধি করতেন মানুষ তার নিজের অধিকার সম্পর্কে এক সময় সচেতন হবে। তিনি বিশ্বাস করতেন সর্বকালের জন্য পৃথিবী আধুনিক যুগের হিংস্র রক্ত পিপাসু শার্দূলদের মুখে সমর্পিত হবে না। এখানে দানবীয় শক্তির প্রত্যক্ষ প্রতীক আসলে 'মারনেওয়ালা', রাজার ভিতরকার মানুষ অর্থাৎ তার বিবেক বলে কল্পনা করা যায় না। কেননা নাটকে কোথাও রাজার সঙ্গে তার কোনো আত্মিক সম্পর্ক আছে বলে মনে হয় না— অভিজিৎ এর আদর্শ রাজার মধ্যে কোনো অন্তর্দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে না। অভিজিৎ-এর মৃত্যুর আকস্মিকতা রাজাকে অভিভূত করে কিন্তু তার অন্তরকে স্পর্শ করেছে এমন কোনো ইঙ্গিত কোথাও নেই। কবির নিজের উক্তি— 'যারা মানুষকে আঘাত করে তাদের মধ্যে একটা বিষম শোচনীয়তা আছে।' — এটা তত্ত্বের দিক থেকে ভালো মানায় কিন্তু বাস্তব জগতে ঘটনার দ্বারা আজ পর্যন্ত সমর্থিত হয়নি। নাটকের ভিতরেও এর কোনো পরিচয় নেই,— না রাজার, না বিভূতির মধ্যে। নাটকে রাজার আদেশে বিভূতি যে বিরাট লৌহযন্ত্র নির্মাণ করেছে, সে কি স্ক্রু-বোল্ট দিয়ে তৈরি মেশিন? যদি এটাই হয়, একজন মানুষের আঘাতে তা ভেঙে দেওয়া কি একটা বস্তুজ্ঞান সম্মত যুক্তিসিদ্ধ কল্পনা?

নাটকের আসল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে পাঠকের কোনো সন্দেহ নেই। যে সময়টাতে বসে রবীন্দ্রনাথ নাটক লিখছেন তখন দেশের সামনে দুটি পথ উন্মুক্ত ছিল। একটি হচ্ছে যাকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন— 'বৈভাষিক রাষ্ট্র-উদ্যম' এবং সাধারণত বলা হয় 'সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন'। অন্যটি গান্ধিজির 'অহিংস আন্দোলন', দু'য়ের লক্ষ এক— সাম্রাজ্যবাদী শাসনচক্রের যান্ত্রিক কাঠামো চূর্ণ করা। গান্ধিজির আদর্শে রবীন্দ্রনাথের নীতিগতভাবে সমর্থন ছিল কিন্তু কর্মপন্থা তাঁকে হতাশ করেছিল। 'মুক্তধারা'য় তিনি এই সমস্যার একটি যুক্তিসিদ্ধ সমাধান আবিষ্কার করলেন— বিভূতির যন্ত্র, যন্ত্রকে দানব বলে কল্পনা করেছেন কারণ তার শক্তি প্রবল এবং তা প্রয়োগে সে নির্মম। রবীন্দ্রনাথ যন্ত্রকে কখনো অস্বীকার করেননি কিন্তু যে মমত্বহীন যান্ত্রিক মনোভাব আধুনিক সভ্যতার কলঙ্ক, তাকে তিনি কঠোর ভাষায় ধিক্কার দিয়েছেন। এর মূল কারণ মানুষের অপরিমেয় লোভ সেটাও তিনি উল্লেখ করেছেন। ধনতান্ত্রিক সভ্যতার এটাই প্রকৃতি। লোভ লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ে চলে। '... এই নিরন্তর উল্লম্ফনের ঝোঁকের মাঝখানে যে পড়ে গেছে তার রোখ চেপে যায়, রক্ত গরম হয়ে ওঠে, বাহাদুরি মত্ততায় সে ভোঁ হয়ে যায়।...' ('শিক্ষার মিলন') তখন তার কোনো হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। কিন্তু এর প্রতিকার সম্বন্ধে তার ধারণা এখন অস্বচ্ছ, মানুষের ক্রন্দনে যে দেবতার ঘুম ভাঙে না এটা স্পষ্ট করে স্বীকার করতে কোনো কুণ্ঠা নেই।

অভিজিতের অভিযানের প্রতীকী ইঙ্গিত খুবই স্পষ্ট, কোনো এক ব্যক্তি কোনো এক যন্ত্রকে ব্যর্থ করতে পারে না। এখানে যন্ত্রের ছিদ্রের অর্থ প্রশাসনিক ব্যবস্থার দুর্বলতা। মানুষের কাছে যখন এই দুর্বলতার প্রকৃতি স্পষ্ট হয় তখনই তাকে ধ্বংস করবার আয়োজন আন্দোলনে পরিণত হয়। তাই নরসিঙ বলে—

নরসিঙ : এই দেখো, দল জুটিয়ে এনেছি, আরও কয় দল আগেই রওয়ানা হয়েছে।

— যারা যন্ত্রের রক্ষক ও উপস্বত্বভোগী তারা এর বিরোধীদের নিরুৎসাহ করবার জন্য মৃত্যুদণ্ডের ভয়কে আইন করে প্রহরী নিযুক্ত করে। একে ভাঙতে চেষ্টা করলে মৃত্যু অবধারিত। যারা এর বিরোধিতায় অধৈর্য হয়ে পড়ে। নিপীড়িত মানুষের যন্ত্রণার সহ্যসীমা অতিক্রম করে। তারা আত্মবিসর্জন অভীপ্সায় উন্মত্ত হয়ে ওঠে।

অভিজিতের মতো তরুণের কথা স্মরণ করেই রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে লিখেছিলেন—

'...আমি যে দেখিনু তরুণ বালক উন্মাদ হয়ে ছুটে
কী যন্ত্রণায় মরেছে পাথরে নিষ্ফল মাথা কুটে।...' ('প্রশ্ন'- ১৯৩২)

'মুক্তধারা' নাটকে সাধারণ মানুষ একসঙ্গে সোচ্চার হয়েছে যন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য। তাই নরসিঙের মতো একজন চরিত্রের গলায় শুনতে পাই 'দল জুটিয়ে এনেছি'। রাস্তায় আরো লোক পাওয়া যাবে কারণ এই সব সাধারণ মানুষই সমাজ

জীবনের যথার্থ পরিচয় বহন করে। এদের আচরণ থেকেই আমাদের সহানুভূতি উত্তরকূট থেকে শিবতরাই-এর দিকে আকৃষ্ট হয়।

মুক্তধারায় যে সমাধান আলোচনা করেছেন তা সম্পূর্ণ রাজনৈতিক। দেশের নেতারাও রাজনৈতিক সমাধানের কথা চিন্তা করেছেন। তাঁদের প্রত্যেকের ন্যূনতম দাবি 'স্বরাজ' অর্থাৎ গণতন্ত্রের প্রসার— নির্বাচনের মাধ্যমে দেশবাসীর হাতে ক্ষমতার হস্তান্তর। পরবর্তীকালে (১৯২১ সালের শেষের দিকে) একে তিনি রাজনৈতিক সেলাই বলে অভিহিত করেছেন— সেলাই কখনোই টেকসই হয় না। ১৯২২ সালে তিনি বলেছেন— '... যেখানে মূলধন ও মজুরির মধ্যে অত্যন্ত ভেদ আছে সেখানে ডেমক্রাসি পদে পদে প্রতিহত হতে বাধ্য। কেননা সকলরকম প্রতাপের বাহক হচ্ছে অর্থ, সেই অর্থ অর্জনে যেখানে ভেদ আছে সেখানে রাজপ্রতাপ সকল প্রজার মধ্যে সমানভাবে প্রবাহিত হতেই পারে না।...' ('সমবায় নীতি'-২-১৯২২)। পাশ্চাত্য দেশের দ্বারা অত্যাচারিত সাধারণ মানুষ যে কীভাবে মুক্তিলাভ করবে তার চিন্তায় মগ্ন রবীন্দ্রনাথ গ্রীষ্মাবকাশ অতিবাহিত করবার জন্য শিলং যান (১৯২৩)। প্রখ্যাত অর্থ ও সমাজতত্ত্ববিদ রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয় শিলঙে। রাধাকমলবাবু সেই সময়ে আহমেদাবাদের মিল মালিক ও শ্রমিকদের সম্পর্কে সরেজমিনে তদন্ত করতে এসেছেন, কবির সাক্ষাতের সময় তিনি তাঁর অভিজ্ঞতার বিশদ বিবরণ দিতেন এবং কবি তা বিশেষ মনোযোগ সহকারে শুনতেন। নিঃসন্দেহে এই ঘটনা তাঁর সৃজনী কল্পনাকে সক্রিয় করে এবং স্বাভাবিকভাবে দ্রুত গতিতে 'রক্তকরবী' নাটকটি রচনা করেন।

১৯২৩ খ্রিস্টাব্দের শেষে 'সমস্যা' প্রবন্ধে তিনি লিখছেন '... সেখানে বাণিজ্য ক্ষেত্রে যারা টাকা খাটাচ্ছে আর যারা মজুর খাটছে, তাদের মধ্যে অধিকারের ভেদ অত্যন্ত বেশি। এই ভেদে পীড়া ঘটায়, সেই পীড়ায় বিপ্লব, ধনীরা ভীত হয়ে ওঠে। কর্মীরা যাতে ভালো বাসস্থান পায়, যাতে তাদের ছেলেপুলেরা লেখাপড়া শিখতে পারে যাতে তারা সকল বিষয়ে কতকটা পরিমাণে আরামে থাকে, দয়া করে মাঝে মাঝে সে চেষ্টা করে, কিন্তু তবু ভেদ যে রয়ে গেল; ধনীর অনুগ্রহের ছিটে ফোঁটায় সেই ভেদ ঘোচে না তাই আপদও মিটতে চায় না...।'

রবীন্দ্রনাথ 'রক্তকরবী'তে যা বলতে চেয়েছেন সেটা অত্যন্ত মৌলিক। ধনবাদকে পরাজিত করতে না পারলে সাম্রাজ্যবাদের অবসান সম্ভব নয়। ধনবাদের পরাজয়ের অর্থ সমাজের ভিত বদল। অর্থাৎ রাষ্ট্রের ক্ষমতা একশ্রেণি থেকে অন্য শ্রেণির হাতে হস্তান্তর। একেই বলে বিপ্লব এবং এই বিপ্লব শ্রেণি সংগ্রামের পরিণতি। এর জন্য সাংস্কৃতিক ও সাংগঠনিক প্রস্তুতি প্রয়োজন। মানুষের পশ্চাৎমুখী প্রবণতা প্রতিরোধ না করলে এ জাতীয় বিপ্লব সব নয়।

এই নাটক যে নগরকে কেন্দ্র করে রয়েছে তার নাম 'যক্ষপুরী'। অন্যত্র রবীন্দ্রনাথ আমেরিকাকে 'ঐশ্বর্যের দানবপুর' (শিক্ষার মিলন) বলেছেন। এই রাষ্ট্রে শ্রমিকরা পাতাল খোদাই করে ধন হরণের কাজে যুক্ত। যারা এই রাষ্ট্রের অনুরাগী তারা আদর করে একে

বলে— 'লক্ষ্মীপুরী', কবি বলেছেন একে 'যক্ষপুরী'। '... কারণ, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার বৈকুণ্ঠে, যক্ষের ভাণ্ডার পাতালে...' (রক্তকরবী-গ্রন্থ পরিচয়)। এই ভাণ্ডারে আলো নেই, বাতাস নেই— প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে। এরপরে রবীন্দ্রনাথ যা বললেন তা সে যুগের চিন্তায় চাঞ্চল্যকর— 'কর্ষণজীবী এবং আকর্ষণজীবী এই দুই জাতীয় সভ্যতার মধ্যে বিষম দ্বন্দ্ব আছে...।' (রক্তকরবী-গ্রন্থ পরিচয়)। এখানে তিনি বলেছেন 'সভ্যতা', পরে 'শ্রেণি' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। কর্ষণজীবী যারা কায়িক পরিশ্রম দ্বারা উৎপাদন করে, আকর্ষণজীবীরা অর্থ গ্রহণ করে গ্রাস করে। '...শোষণজীবী সভ্যতার ক্ষুধাতৃষ্ণা দ্বেষহিংসা বিলাসবিভ্রম সুশিক্ষিত রাক্ষসেরই মতো...' (রক্তকরবী-গ্রন্থ পরিচয়)। গ্রাম থেকে কৃষিজীবীরা যে অর্থের লোভে শহরের কলকারখানায় যোগ দিচ্ছে- প্রকৃতি বিলাসী কবি এতে বাস্তবিকই পীড়িত হতেন— নাটকে এমন ইঙ্গিতও আছে। রবীন্দ্রনাথ এখানে শ্রেণি সংগ্রামের কথা বলেছেন, যা ধনবাদী সমাজে আজও প্রবলভাবে অস্বীকৃত। কর্ষণজীবী ও আকর্ষণজীবী এই দুই শ্রেণির মধ্যে দ্বন্দ্ব নাটকের মূল বিষয়। রবীন্দ্রনাথ 'শ্রেণি' কথাটি সাবধানে উত্থাপন করে ভুলে যেতে বলেছেন। কারণ শব্দটি আজও আতঙ্কিত করে।

নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র নন্দিনী। তিনি মনে করেন, নারী বিশেষ করে মানবিক বোধের দয়া, মমতা, স্নেহ, প্রীতি এই সব গুণের প্রতিমূর্তি। রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন প্রশাসনে এই মানবিক বোধ সঞ্চার করলে, তার মৌলিক রূপান্তর ঘটানো সম্ভব। সেজন্য রক্তকরবী গ্রন্থ পরিচয়ে পাই। '... মাটির উপরিতলে যেখানে প্রাণের যেখানে রূপের নৃত্য, যেখানে প্রেমের লীলা, নন্দিনী সেই সহজ সুখের, সেই সহজ সৌন্দর্যের।...'

নাটকে কিশোর একজন খোদাইকার। সে নন্দিনীকে রক্তকরবী এনে দেয়, এরজন্য কিশোরকে শাস্তি পেতে হয়। যারা শাস্তি দিল কিশোরকে, নন্দিনী 'জানোয়ার' শব্দটি প্রয়োগ করলো তাদের প্রতি। অর্থাৎ এরা মানবিক বোধ বর্জিত। এদের রণদামামা, হুংকার গ্রাহ্য করে না কিশোরও। এখান থেকে বুঝতে পারি যক্ষপুরীর মধ্যে একটি প্রচণ্ড বিরোধ বর্তমান। এই বিরোধকেই রবীন্দ্রনাথ 'প্রস্তাবনা'য় কর্ষণজীবী ও আকর্ষণজীবীদের মধ্যে বিরোধ বলে উল্লেখ করেছেন। এই বিরোধই নাটকের মূল বিষয়।

নন্দিনীর কথিত জানোয়াররাই নাটকে সর্দার বলে পরিচিত। তাদের স্বার্থে রাষ্ট্রস্বার্থ পরিচালিত হয়। 'রাজা' যে তাল তাল সোনা সংগ্রহ করছে তার উপস্বত্বভোগী এই সর্দারেরা। তারা শ্রমিক অসন্তোষের অস্তিত্ব অনুভব করে এবং তার প্রশমনের জন্য নানা উপায় অবলম্বন করে। শ্রমিকদের নেতাকে নেশায় আচ্ছন্ন রাখে। এখানে মন্দির ও মদের দোকান পাশাপাশি। মদের নেশা ও ধর্মের নেশার উদ্দেশ্য এক, বুদ্ধিকে ঝিমিয়ে রাখা।

নাটকে ফাগুলাল একজন শ্রমিক। কাজের পরে সন্ধেবেলায় স্ত্রীর কাছে মদ দাবি করে। অন্যদিকে সর্দার এক গোঁসাইকে আমদানি করে। ফাগুলালের স্ত্রী চন্দ্রা গোঁসাইয়ের প্রতি ভক্তিতে

গদগদ হয়ে ওঠে। কিন্তু ফাগুলাল রুখে দাঁড়ায়। সে জানে এগুলি ভণ্ডামি। এ থেকে বোঝা যায় শ্রমিকদের মধ্যে একটা আস্তিক্যবাদী অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়েছে।

রবীন্দ্রনাথের মতে নাটকে কোথাও অলৌকিক বা ঐশ্বরিক শক্তির অনুপ্রবেশের সম্ভাবনা নেই। এ সংগ্রাম আপসহীন ও বিপ্লবাত্মক, আর বিপ্লব কোনো আকস্মিক অভ্যুত্থান নয়। এরজন্য সক্রিয় প্রস্তুতির প্রয়োজন হয় প্রতিক্ষেত্রেই। এটাই নন্দিনী ও রঞ্জনের ভূমিকার তাৎপর্য। এ সম্বন্ধে নাটকের শেষের দিকে সর্দারের একটি উক্তি রবীন্দ্রনাথের সচেতনতা প্রমাণ করে। যখন তার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হলো, সর্দার নন্দিনীকে স্পষ্ট ভাষায় বলছে— '... এতদিন কীটের মতো নিঃশব্দে মাটির নীচে গর্ত করে সে (বিশু) চলেছিল, তাকে মরবার পাখা মেলতে শিখিয়েছ তুমিই, ওগো ইন্দ্রদেবের আগুন! অনেককে টানবে, তার পরে শেষ বোঝাপড়া হবে তোমাতে-আমাতে, বেশি দেরি নেই।... ''রক্তকরবী'তে রঞ্জনের ক্রিয়াকলাপ ও রঞ্জন সম্বন্ধে সর্দারের দারুণ ভয় এটা প্রমাণ করে বিপ্লবের একটি সাংগঠনিক প্রস্তুতি রবীন্দ্রনাথ কল্পনা করেছিলেন। তিনি এই যুদ্ধের কথা কখনোই ভাবেননি। তার সংস্কার মুক্ত সত্যসন্ধানী মনই তাঁকে এই উপলব্ধিতে উপনীত হতে সাহায্য করেছিল।

এরপরে আসি 'রথের রশি' নাটকে। ১৯৩০ সালে তিনি আমেরিকা, পশ্চিম য়ুরোপ ও রাশিয়া ভ্রমণ করলেন। সেই সময়টায় সাংঘাতিক মন্দা চলছে। ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে যে ব্যবধান তা অত্যন্ত দৃষ্টিকটু। অপরদিকে রাশিয়ায় দেখলেন সর্বব্যাপী দারিদ্র, কিন্তু মানুষে মানুষে অর্থের বৈষম্য, অধিকারের বৈষম্য চিরতরের জন্য বিলুপ্ত হয়েছে। ফলে সমগ্রজাতি নতুন সৃষ্টির উৎসাহের জন্য উজ্জীবিত, কিন্তু ভারতবর্ষে ফিরে দেখলেন অন্যরূপ। লবণ-সত্যাগ্রহের পর ধন বৈষম্য মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। রাশিয়া ছাড়া সর্বত্রই যেন মানুষে মানুষে দ্বন্দ্ব ক্রমশ পাকিয়ে উঠছে। একদিকে নিষ্প্রাণ গতানুগতিকতার আবর্ত, অন্যদিকে জনজীবনের দুরন্ত প্রবাহ তাঁর চেতনাকে আশ্রয় করলো। এই ঘটনার প্রতিফলন ঘটেছে 'রথযাত্রা'র মধ্যে।

একটি রথকে সমাজের উঁচু শ্রেণির মানুষরা টানবার চেষ্টা করছে। কিন্তু কোনো মতেই রথটি চলছে না, একসময় শূদ্ররা এসে সেখানে হাত লাগালে রথটা চলতে শুরু করে। রথযাত্রা রচনাকালের সময় বিশ্বজোড়া একটা বিভ্রান্তিকর অচলাবস্থা চলছিল। যেন সাধারণ মানুষের জীবনের গতিশীলতা রুদ্ধ, নাগরিকরা ব্যর্থ আলোচনায় মত্ত। সকলেই এই অবস্থার নিরসনে ব্যর্থ। এই অবস্থায় সন্ন্যাসী এসে অবস্থার প্রকৃত কারণ সম্বন্ধে অবহিত করে তাদের উদ্দেশ্যে ভৎর্সনার সুরে বলে—

... দেখতে পাচ্ছ না— আজ ধনীর আছে ধন,
তার মূল্য গেছে ফাঁক হয়ে গজভুক্ত কপিত্থের মতো।
ভরা ফসলের খেতে বাসা করেছে উপবাস।
যক্ষরাজ স্বয়ং তার ভাণ্ডারে বসেছে প্রায়োপবেশনে।...' (কালের যাত্রা)

'রথের রশি'তে দ্বন্দ্ব তেমন ভাবে ঘনীভূত হয় না কোথাও তার পূর্বেই রূপান্তরিত হয়ে যায়।

একনজরে যদি এই তিনটি নাটকের মূল্যায়ন করতে চাই তাহলে দেখি, 'রক্তকরবী' নাটকে শোষণের কেন্দ্র যক্ষপুরীর বিরুদ্ধে সমাজের শোষিত মানুষরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং শোষণ থেকে মুক্তি পেতে চায়, তাই ফাগুলালের গলায় শুনি— 'বন্দিশালার দরজা ভাঙতে, মরি তবু ফিরব না।' আবার 'মুক্তধারা' নাটকের বিষয়বস্তু সাম্রাজ্যবাদী দেশের বিরুদ্ধে দুর্বল উপনিবেশের মুক্তি সংগ্রাম। নরসিঙ বলে— 'এই দেখ, দল জুটিয়ে এনেছি। আরও কয় দল আগেই রওয়ানা হয়েছে।' কিংবা 'রথের রশি'র মতো নাটকে দেখি, উচ্চ শ্রেণির হাত থেকে সমাজের দায়িত্ব সাধারণ মানুষের হাতে তুলে দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এখানে দলপতির সংলাপ— 'আয়রে ভাই, লাগাই টান, মরি আর বাঁচি।' এগুলি দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের প্রতিফলন।

নাট্য আঙ্গিকগুলিকে বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাবো— 'রক্তকরবী', 'মুক্তধারা', বা 'রথের রশি' নাটকগুলির আঙ্গিক মাত্র একটি। জড়শক্তির সঙ্গে প্রাণশক্তির বিরোধ এবং পরিণামে প্রাণের অবশ্যম্ভাবী জয়লাভ। জড়ত্ব ও প্রাণের বিরোধ, বন্ধন ও মুক্তির বিরোধে রূপান্তরিত এবং সেই বিরোধের ফলে বন্ধন ছিন্ন করে মুক্তির মহৎ প্রকাশ হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের এই সমস্ত নাটকগুলি বিনোদনের জন্য বা মননের খোরাক হিসাবে রচিত হয়নি। এই নাটকগুলো তেমনভাবে মঞ্চ সাফল্য পায়নি এবং এই নাটকগুলির মধ্যে প্রকটভাবে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের প্রাধান্য আছে।

স্বাধীনতার ৭৪ বছর পরে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা আমরা এখনো লাভ করতে পারিনি। আজও দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা প্রায় সাতাত্তর শতাংশ। আর কালোবাজারি সৃষ্টি করে অর্থের প্রাচুর্য গড়ে তুলেছে কতকগুলি মুষ্টিমেয় মানুষ। তাই শিল্পপতিদের সঙ্গে সাধারণ শ্রমিকদের দ্বন্দ্ব কোনো না কোনো সময় লেগেই থাকে। রবীন্দ্র নাটকেও দেখি এরকম একাধিক প্রেক্ষাপট। যেখানে সাধারণ শ্রমিকদের সঙ্গে বিরোধ বেঁধেছে শোষকদের। তাই আজও রবীন্দ্র নাটকে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ সমানভাবে প্রাসঙ্গিক।

সবশেষে কতকগুলো রূপকল্প আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়— রক্তকরবী-তে রাজা নিজেকে মরুভূমি বলে বর্ণনা করে বলেছিল '...আমি প্রকাণ্ড মরুভূমি...তৃষ্ণার দাহে এই মরুটা কত উর্বরা ভূমিকে লেহন করে নিয়েছে...। মুক্তধারায় বটুক বলছে— 'ওরা পূজার বেদীতে দেবতার জায়গায় তৃষ্ণাদেবীকে বসিয়েছে।' আবার রথের রশিতে পাই— '...তাঁর প্রসাদধারা শুষে নিচ্ছে, মরুভূমিতে ফলছে না কোন ফল...।' অর্থাৎ যে সমাজ ব্যবস্থা এই প্রকার অচলাবস্থার সৃষ্টি করে তার অতৃপ্ত বাসনা শুধু লেহন করে, শোষণ করে, দেউলে করে দেয় যুগের বৃত্তকে। নাগরিকদের মধ্যে দেখা দেয় চরম বিভ্রান্তি। এই বিভ্রান্তি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সমাজের সাধারণ শ্রমিক একত্রিত হয় ও প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার প্রতি রুখে

দাঁড়ায়, বিদ্রোহ ঘোষণা করে। রবীন্দ্রনাথ সচেতন ভাবে যে শ্রেণি সংগ্রাম বা দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদকে প্রাধান্য দিয়েছেন তা নয় বরং সমকালীন সমাজ পরিস্থিতিতে নাটক রচনা করতে গিয়ে যেন অবচেতন মনে তাঁর বহু নাটকে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ প্রাধান্য পেয়েছে।

গ্রন্থঋণ :

১. সত্যেন্দ্রনাথ রায় : রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাসের জগৎ। কলকাতা
২. প্রমথনাথ বিশী : রবীন্দ্রনাট্য প্রবাহ। পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ। কলকাতা।
৩. কনক বন্দ্যোপাধ্যায় : রবীন্দ্রনাথের তত্ত্বনাটক। কলকাতা।
৪. শশিকুমার দাশগুপ্ত : রবীন্দ্রনাথের এক রূপকনাট্য। কলকাতা।
৫. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য : রবীন্দ্রনাট্য পরিক্রমা। কলকাতা।
৬. ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ : রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক নাটক। কলকাতা।
৭. রমেন্দ্র নারায়ণ নাগ : রবীন্দ্র নাটকে গানের ভূমিকা। কলকাতা।
৮. সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল : রবীন্দ্রনাথের নাট্যপ্রতিভা। কলকাতা।
৯. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : রবীন্দ্রসৃষ্টি সমীক্ষা। কলকাতা।
১০. আনন্দময় ভট্টাচার্য : রবীন্দ্র কাব্যচর্চার নানা দিগন্ত। কলকাতা।
১১. অরুণকুমার বসু : রবীন্দ্রবিচিন্তা। কলকাতা।